Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:08 - Last Updated Tuesday, 26 October 2010 00:41

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধটি নিছক সামরিক বা রাজনৈতিক নয়। বরং সে যুদ্ধটি প্রবল ভাবে হচ্ছে প্রতিটি মুসলিম দেশের সাংস্কৃতিক ময়দানে। সাংস্কৃতিক যুদ্ধের তেমনি একটি উত্তপ্ত রণাঙ্গণ হলো বাংলাদেশ। পাশ্চাত্যের সে কোয়ালিশনে যোগ দিয়েছে আরেক আগ্রাসী দেশ ভারত। ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী পাশ্চাত্য এজেন্ডার সাথে ভারতীয় এজেন্ডা এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। শত্রুপক্ষের এ কোয়ালিশন আফগানিস্তান,ইরাক বা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজ যা কিছু করছে, ভারত অবিকল সেটিই করছে বিগত ৬০ বছরের বেশী কাল ধরে করছে অধিকৃত কাশ্মীরের অসহায় মুসলমানদের সাথে। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে এ পক্ষটি অতি-উৎসাহী সহযোদ্ধা রূপে পেয়েছে দেশটির বিপুল সংখ্যক সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সাংস্কৃতিক ক্যাডার, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাংবাদিক, এবং বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা।

বিশ্ব-রাজনীতির অঙ্গণ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিদায়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল তাদের পথের কাঁটা এবার দূর হলো। আধিপত্য বিস্তৃত হবে এবার বিশ্বজুড়ে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আফগানিস্তান ও ইরাকের মত দুইটি দেশে দখলে রাখতেই তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ শেষ হতে ৫ বছর লেগেছিল। কিন্তু বিগত ৭ বছর যুদ্ধ লড়েও মার্কিন নেতৃত্বাধীন ৪০টিরও বেশী দেশের কোয়ালিশ বাহিনী আফগানিস্তানে বিজয় আনতে পারেনি। বরং দ্রুত এগিয়ে চলেছে পরাজয়ের দিকে। এখন তারা জান বাঁচিয়ে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। পাশ্চাত্যের কাছে এখন এটি সুস্পষ্ট, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবানন, সোমালিয়ার মত ক্ষুদ্র দেশগুলো দখল করা এবং সেগুলোকে কন্ট্রোলে রাখার সামর্থ তাদের নেই। যে প্রতিরোধের মুখে তারা হারতে বসেছে সেটির মূল হাতিয়ার অত্যাধিক যুদ্ধাস্ত্র নয়, জনবল বা অর্থবলও নয়। বরং সেটি কোরআনী দর্শন ও ইসলামের সনাতন জিহাদী সংস্কৃতি। এ দর্শন ও সংস্কৃতিই মুসলমানের জন্য আত্মসমর্পণকে অসম্ভব ও অচিন্তনীয় করে তুলেছে। বরং অতি কাম্য গণ্য হচ্ছে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই ও শাহাদত। এমন চেতনা এবং এমন সংস্কৃতির বলেই এক কালের মুসলমানেরা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করেছিল। এ যুগেও তারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও বিশ্বশক্তি রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। এবং এখন গলা চেপে ধরেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কামান, বোমা ও যুদ্ধবিমানের বলে গণহত্যা চালানো যায়। নগর-বন্দরও ধ্বংস করা যায়। কিন্তু সে কামানে বা গোলায় কি দর্শন ও সংস্কৃতির বিনাশও সম্ভব? বরং তাদের আগ্রাসন ও গণহত্যায় প্রতিরোধের সে দর্শন ও সংস্কৃতিই দিন দিন আরো বলবান হচ্ছে। কোন মার্কিনীকে রণাঙ্গণে রাখতে মাথাপিছু প্রায় ১০ লাখ ডলার খরচ হয়। অথচ মুসলমানরা হাজির হচ্ছে নিজ খরচে। তারা শুধু স্বেচ্ছাই অর্থই দিচ্ছে না, প্রাণও দিচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাশ্চাত্য এখন ভিন্ন স্ট্রাটেজী নিয়েছে। সেটি শুধু গণহত্যা নয়। নিছক নগর-বন্দর, ঘরবাড়ী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনাশও নয়। বরং সেটি ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের। তাই শুরু করেছে প্রকান্ড আকারের সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। নতুন এ স্ট্রাটেজীর আলোকে ইরাক ও আফগানিস্তানে তারা শুধু মানুষ হত্যাই করছে না,ঈমান হত্যাতে তৎপর হয়েছে। এবং সেটি শুধু আফগানিস্তান ও ইরাকে সীমিত নয়। বাংলাদেশের ন্যায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই এখন একই রূপ সাংস্কৃতিক যুদ্ধের শিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের লক্ষ্য, মুসলমানদের জীবন থেকে জিহাদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত করা। সে লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শকে ভূলিয়ে দেওয়া। তেমন এক স্ট্রাটেজী নিয়ে ব্রিটিশগণ ভারতে আলিয়া মাদ্রাসা খুলেছিল। আর এখন সে কাজে বাংলাদেশে ব্যবহার করতে চায় জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়। সে সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে ব্যাপক মিথ্যা-প্রপাগান্ডা। বলতে চায়, ইসলাম এ যুগে অচল। শরিয়তকে বলছে মানবতা বিরোধী। সে প্রপাগান্ডাকে ব্যাপকতর করতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বহু টিভি চ্যানেল, অসংখ্য পত্র-পত্রিকা এবং হাজার হাজার এনজিও। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা হলো, নবীজী (সাঃ)র আমলের ইসলামকে জনগণের মন থেকে ভূলিয়ে দেওয়া। অথচ ইসলাম থেকে নামায-রোযাকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি আলাদা করা যায় না জিহাদকেও। পবিত্র কোরআনে জিহাদে অংশ নেওয়ার নির্দেশ এসেছে বার বার। সে সব জিহাদে অর্ধেকের বেশী সাহাবা শহীদ হয়েছেন। নবীজী (সাঃ) নিজে রক্তাক্ষয়ী বহু যুদ্ধ লড়েছেন বহুবার। ইসলামের বহু শত্রুকে হত্যা এবং বনু কুরাইজা ও বনু নাযির ন্যায় ইহুদী বস্তিকে নির্মূল করা হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অথচ নবীজী (সাঃ)র সে আপোষহীন

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:08 - Last Updated Tuesday, 26 October 2010 00:41

নীতিও ইসলামের সে সংগ্রামী ইতিহাসকে তারা সুপরিকল্পিত ভাবে আড়াল করতে চায়। নামায-রোযা, হজ-যাকাতের বাইরেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও আইন-আদালতের সংস্কারে ঈমানদারের যে গুরুতর দায়ভার রয়েছে সেটিকেও ভুলিয়ে দিতে চায়।

ইসলামের আক্বিদা-বিশ্বাস ও জিহাদী সংস্কৃতি আজ এভাবেই দেশে দেশে শত্রুপক্ষের হামলার শিকার। তাদের লক্ষ্য, মহান আল্লাহর কোরআনী নির্দেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিদ্রোহী করা। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য বিপদের কারণ হলো, এরূপ হামলার মুখে দেশটির ভৌগলিক সীমান্তের ন্যায় সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সীমান্তও আজ অরক্ষিত। অথচ মুসলমানদের দায়িত্ব শুধু দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া নয়। বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, চেতনার রাজ্য পাহারা দেওয়া। এবং সেটি সুস্থ্য ঈমান-আক্বিদা ও ইসলামি সংস্কৃতি গড়ে তোলার স্বার্থে। সীমান্ত পাহারায় অবহেলা হলে অনিবার্য হয় পরাজয় ও গোলামী। তখন বিপন্ন হয় জানমাল ও ইজ্জত-আবরু। যেমনটি ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে হয়েছিল। সে পরাজয়ের ফলেই মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছিল ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের দাসত্ব। একই রূপ ভয়ানক পরিণতি নিয়ে আসে সাংস্কৃতিক ময়দান অরক্ষিত হলেও। তখন অসম্ভব হয় সুস্থ্য ঈমান-আক্বিদা নিয়ে বেড়ে উঠা। আর মুসলমানের কাছে জানমালের চেয়ে ঈমান ও আক্বিদার গুরুত্ব কি কম? ঈমান নিয়ে বাঁচা অসম্ভব হলে অর্থহীন হয় জীবনে বাঁচাটাই। সে বাঁচা তখন অনিবার্য করে জাহান্নামের আযাব। ভৌগলিক সীমান্তকে সুরক্ষিত করার চেয়েও তাই গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈমান-আক্বিদার এ সীমান্তকে সুরক্ষিত করা। কারণ শয়তানী শক্তির সবচেয়ে বিনাশী হামলা হয় চেতনার এ মানচিত্রে। এটি অধিকৃত হলে দেশ দখল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রতিটি ঈমানদারকে তাই সে হামলার বিরুদ্ধে লাগাতর জিহাদ করতে হয়। সশস্ত্র যুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে অন্ধ-বধির বা পঙ্গু ব্যক্তির নিষ্কৃতি আছে। কিন্তু চেতনার মানচিত্রে শয়তানী শক্তির আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক হামলার বিরুদ্ধে যে লাগাতর জিহাদ তা থেকে সামান্য ক্ষণের নিষ্কৃতি নেই। এ জিহাদকেই ইসলামে জিহাদে আকবর বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রের লড়াইটি আসে তার পরে। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের আগে তেরোটি বছর ধরে এ জিহাদ লাগাতর চলেছে মক্কায়। মুসলমানের চেতনা রাজ্যের ময়দানকে সুরক্ষিত রাখার স্বার্থেই অপরিহার্য হলো মুসলিম ভূমির ভৌগলিক মানচিত্রকে সুরক্ষিত করা।

শুধু ঘরবাঁধা, চাষাবাদ করা বা কলকারখানা গড়াই একটি জনগোষ্ঠির বেঁচে থাকার জন্য সবকিছু নয়। শুধু পানাহারে জীবন বাঁচে বটে, তাতে ঈমান বাঁচে না। এমন বাঁচার মধ্য দিয়ে সিরাতুল মোস্তাকিমও জোটে না। তখন যা জুটে তা হলো পথভ্রষ্টতা। সে পথভ্রষ্টতায় বিপদাপন্ন হয় শুধু পার্থিব জীবনটাই নয়, অনন্ত অসীম কালের আখেরাতের জীবনও। ইহকাল ও পরকাল বাঁচাতে এজন্যই একজন চিন্তাশীল মানুষকে বেড়ে উঠতে হয় জীবন-বিধান, মূল্যবোধ, জীবন ও জগত নিয়ে একটি সঠিক ধারণা নিয়ে। মুসলমানের কাছে সে জীবন-বিধান হলো ইসলাম। আর নিত্যদিনের বাঁচবার সে প্রক্রিয়া হলো ইসলামী সংস্কৃতি। নামায-রোযা, হজ-যাকাত এবং জিহাদ হলো একজন ঈমানদারের ইবাদতের প্রক্রিয়া। আর সংস্কৃতি হলো এ জগতে বাঁচবার বা জীবনধারনের প্রক্রিয়া। ইসলামি পরিভাষায় এ প্রক্রিয়া হলো তাহজিব। আরবী ভাষায় তাহজিবের অর্থ হলো, ব্যক্তির কর্ম, রুচী, আচার-আচারণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সার্বিক জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধি করণের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ রিফাইনড হয় তথা সুন্দরতম হয়। দিন দিন সুন্দরতম হয় তার রুচীবোধ, আচার-আচরণ, কাজকর্ম ও চরিত্র। তাই মুসলমানের ইবাদত ও সংস্কৃতি-এ দুটোকে পৃথক করা যায় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পায় আল্লাহতায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া গভীর প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। পাখি যেমন তার দুটো ডানার একটিকে হারালে উড়তে পারে না, ঈমানদারও তেমনি আল্লাহর ইবাদত ও ইসলামী সংস্কৃতির একটি হারালে মুসলমান রূপে বেড়ে উঠতে পারে না। তাই মুসলমানগণ যেখানে রাষ্ট্র গড়েছে সেখানে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসাই গড়েনি, ইসলামি সংস্কৃতিও গড়েছে। একটির পরিশুদ্ধি ও শক্তি আসে অপরটি থেকে। মোমেনের মূল্যবোধ, রুচীবোধ, পানাহার, পোষাকপরিচ্ছদ, অপরের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তার আল্লাহভীরুতা। অন্যের কল্যাণে সচেষ্ট হয় স্বার্থ চেতনায় নয়, বরং আল্লাহর কাছে প্রিয়তর হওয়ার চেতনায়। এ হলো তার সংস্কৃতি। এমন সংস্কৃতি থেকে সে পায় ইবাদতের স্পিরিট। ঈমানদারের চিন্তা ও কর্মে এভাবেই আসে পবিত্রতা -যা একজন কাফের বা মোনাফিকের জীবনে কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম সমাজে এভাবেই আসে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্লিলতা। অথচ সেকুলার সমাজে সেটি আসে না। সেকুলার সমাজে যেটি প্রবলতর হয় সেটি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের প্রেরণা। মানুষ এখানে জীবনের উপভোগে স্বেচ্ছাচারী হয়। সে স্বেচ্ছাচারকে তারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেবাস পড়িয়ে জায়েজ করে নিতে চায়। সেকুলার সমাজে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, সমকামিতা, অশ্লিলতা, মদ্যপাণের ন্যায় নানাবিধ পাপাচার বৈধ্যতা পায়। তো জীবন উপভোগের এমন

স্বেচ্ছাচারি প্রেরণা থেকেই। ফলে সেক্যুলারিজম যেখানে প্রবলতর হয় সেখানে পাপাচারেও প্লাবন আসে।

অথচ মুসলমান ইবাদতে প্রেরণাও পায় তার সংস্কৃতি থেকে। ফলে স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় না গিয়েও মুসলিম সমাজে বসবাসকারি যুবক তাই মসজিদে যায়, নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং মানুষের কল্যাণ সাধ্যমত চেষ্টাও করে। সীমান্তের প্রতিরক্ষায় বা শরিয়তের প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ময়দানেও হাজির হয়। একাজে শুধু শ্রম-সময়-মেধা নয়, জানমালের কোরবানীও দেয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসার ডিগ্রিধারি না হয়েও নিজেকে বাঁচায় বেপর্দা, ব্যাভিচার, অশ্লিলতা, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস-কর্ম ও নানা বিধ পাপাচার থেকে। প্রাথমিক কালের মুসলমানগণ যে মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার জন্ম দিতে পেরেছিলেন সেটি এজন্য নয় যে সেদিন বড় বড় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসা ছিল। বরং তখন প্রতিটি ঘর পরিণত হয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান। সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে গড়ে উঠছিল ইসলামী সংস্কৃতির বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেদিনের মুসলমানেরা উন্নত মানব রূপে বেড়ে উঠতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের ন্যায় অধিকাংশ মুসলিম দেশের আজকের বড় সমস্যা এ নয় যে, দেশগুলি অধিকৃত হয়েছে। বরং সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সে সাথে ভয়ানক বিপদের কারণ হলো,দেশগুলির সাংস্কৃতিক সীমান্ত বিলুপ্ত হয়েছে এবং তা অধিকৃত হয়েছে ইসলামের শত্রুপক্ষের দ্বারা। দেশের সীমান্ত বিলুপ্ত না হলেও মুসলিম দেশগুলির সংস্কৃতির ময়দান শত্রু পক্ষের দখলে গেছে। ফলে এদেশগুলিতেও তাই হচ্ছে যা কাফের কবলিত একটি দেশে হয়ে থাকে। মুসলিম দেশের সংস্কৃতিও পরিনত হয়েছে মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য রূপে গড়া তোলার ইন্সটিটিউশনে। এর ফলে বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলিম সন্তান মসজিদে না গিয়ে হিন্দুদের ন্যায় মঙ্গলপ্রদীপ হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করছে। কপালে তীলক পড়ছে, নাচগানও করছে। যুদ্ধাংদেহী রূপ তাদের শরিয়তের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে।

ব্যক্তির জীবনে প্রতিটি পাপ, প্রতিটি দুর্বৃত্তি, আল্লাহর হুকুমের প্রতিটি অবাধ্যতাই হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা প্রকাশ পায় বেপর্দা, ব্যাভিচার, অশ্লিলতা, মদ্যপান, মাদকাশক্তি, সন্ত্রাস, দূর্নীতি ইত্যাদির ব্যাপক বৃদ্ধিতে। জাতীয় জীবনে সেটি প্রকাশ পায় দেশে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা, সুদমুক্ত ব্যাংক ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে আল্লাহর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহে সমগ্র বিশ্বমাঝে একবার নয়, ৫ বার শিরোপা পেয়েছে। সে বিদ্রোহ ঘটছে আল্লাহ-প্রদর্শিত সুনীতির স্থলে দূর্নীতির মধ্য দিয়ে। এরূপ বার বার শিরোপা লাভই বলে দেয় দেশটির মানুষের জীবনযাত্রার প্রক্রিয়া বা সংস্কৃতি কতটা অসুস্থ্য ও বিদ্রোহাত্মক।

ব্যক্তির সংস্কৃতির পরিচয় মেলে কীভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ পড়লো বা পানাহার করলো তা থেকে নয়। বরং কীরূপ দর্শন বা চেতনা নিয়ে সে বাঁচলো তা থেকে। সংস্কৃতির মূল উপাদান হলো এটি। দর্শনই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। নাচগান পশুপাখিও করে। কিন্তু তাতে কোন দর্শন থাকে না। তাই পশুপাখির নাচে-গানে কোন সমাজই সভ্যতর হয় না, সেখানে সভ্যতাও নির্মিত হয় না। তাই যে সমাজের সংস্কৃতি যতটা দর্শন-শূন্য সে সমাজ ততটাই মানবতা বর্জিত। সে সমাজ তখন ধাবিত হয় পশুত্বের দিকে। দর্শনই নির্ধারণ করে দেয় কে কীভাবে বাঁচবে, কীভাবে পানাহার করবে, কীভাবে জীবন যাপন করবে বা উৎসব করবে সেটি। চেতনার এ ভিন্নতার কারণেই একজন পতিতা, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী এবং দুর্বৃত্তের বাঁচার ধরণ,পোষাক-পরিচ্ছদ, পানাহার ও উৎসবের ধরণ ঈমানদারের মত হয় না। মুসলমানের সংস্কৃতি এজন্যই অবিশ্বাসী বা কাফেরের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বিশেষ বিশ্বাস বা দর্শন জন্ম দেয় একটি বিশেষ রুচী ও সে রুচীভিত্তিক অভ্যাস। সে অভ্যাসের কারণেই ব্যক্তি বেড়ে উঠে সে সংস্কৃতির মানুষ রূপে। সংস্কৃতি এভাবেই সমাজে নীরবে কাজ করে। মুসলিম সমাজ থেকে সৎ নামাযী ও রোযাদারের পাশাপাশী আপোষহীন মোজাহিদ বের হয়ে আসে তা তো সংস্কৃতির সে ইন্সটিটিউশন সক্রিয় থাকার কারণেই। যেখানে সেটি নেই, বুঝতে হবে সেখানে সে পূণ্যময় সংস্কৃতিও নাই।

মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস তেল-গ্যাস নয়, জনশক্তিও নয়। সে শক্তি হলো কোরআন ভিত্তিক দর্শন ও সে

Written by ফরিদ মাহবুব কামাল
Thursday, 05 August 2010 19:08 - Last Updated Tuesday, 26 October 2010 00:41

দর্শন-ভিত্তিক সংস্কৃতি। এজন্যই শত্রুপক্ষের আগ্রাসনের শিকার শুধু মুসলিম দেশের ভূগোল নয়, বরং মূল টার্গেট হলো ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি। তাই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বাংলাদেশের মত দেশে বোমা বা যুদ্ধবিমান নিয়ে হাজির হয়নি। হাজির হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রকল্প নিয়ে। বাংলাদেশের হাজার হাজার এনজিওর উপর দায়িত্ব পড়েছে সে প্রকল্পকে কার্যকর করা। দেশের সংস্কৃতিকে তারা এভাবে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে। রাস্তায় মাটি কাটা ও তুত গাছ পাহাড়া দেওয়াকে মহিলার ক্ষমতায়ন বলে এসব এনজিওগুলো তাদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করছে। অপর দিকে মাইক্রোক্রেডিটের নামে সাধারণ মানুষকে সূদ দিতে ও সূদ খেতেও অভ্যস্থ করছে। অথচ সূদ খাওয়া বা সূদ দেওয়া –উভয়ই হলো আল্লাহতায়ালার বিধানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। ডক্টর ইউনুসকে পাশ্চাত্য মহল নোবেল প্রাইজ দিয়েছে। সেটি এজন্য নয় যে, বাংলাদেশ থেকে তিনি দারিদ্র্য নির্মূল করেছেন। বরং দেশে যতই বাড়ছে গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক বা সূদ ভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট এনজিওর শাখা ততই বাড়ছে দারিদ্র্য। ডক্টর ইউনুস নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহ করতে তিনি অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের চলমান যুদ্ধের মূল এজেন্ডা কি সেটি বুঝা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের আফগানিস্তান দখল ও সেখানে চলমান কার্যক্রম থেকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সেখানে মুসলিম সংস্কৃতির বিনাশে হাত দিয়েছে। আফগানিস্তানের অপরাধ, অতীতে দেশটির জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করেছে। এবং সেটি কোন জনশক্তি, সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক শক্তির বলে নয়, বরং ইসলামী দর্শন ও সে দর্শন-নির্ভর আপোষহীন জিহাদী সংস্কৃতির কারণে। সে অভিন্ন দর্শন ও দর্শনভিত্তিক সংস্কৃতির বলেই তারা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রদের পরাজিত করতে চলেছে। ফলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সে দর্শন ও সে দর্শন-ভিত্তিক সংস্কৃতির নির্মূলে করতে চায়। এবং সে বিনাশী কর্মের পাশাপাশি বিপুল বিনিয়োগ করছে সেদেশে সেক্যুলার দর্শন ও সেক্যুলার সংস্কৃতির নির্মানে। এটিকে তারা বলছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অবকাঠামোর নির্মান। পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলছে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এগুলোর কাজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আজ যা করছে সেগুলোকেই অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশরের মত দেশে অতীতে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সফলতা পেয়েছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা। এদেশগুলির উপর তাদের দীর্ঘ শাসনামলে তেমন কোন শিল্প কলকারখানা বা প্রযুক্তি গড়ে না উঠলেও তারা সেসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেক্যুলার করেছিল। ফলে এনেছে সাংস্কৃতিক জীবনে প্রচন্ড বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি। সেক্যুলারলিজমের অভিধানিক অর্থ হলো ইহজাগতিকতা। সেক্যুলারিজমের অর্থ, ব্যক্তির কাজ-কর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রেরণা পাবে ইহজাগতিক আনন্দ-উপভোগের তাগিদ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। এ উপভোগ বাড়াতেই সে নাচবে, গাইবে, বেপর্দা হবে, অশ্লিল নাটক ও ছায়াছবি দেখবে। সে মদ্যপান করবে এবং ব্যাভিচারিতেও লিপ্ত হবে। উপার্জন বাড়াতে সে সূদ খাবে এবং ঘুষও খাবে। এগুলো ছাড়া তাদের এ পার্থিব জীবন আনন্দময় হয় কি করে? তাই সেক্যুলারিজম বাড়লে এগুলো বাড়বে অনিবার্য কারণেই। অপর দিকে ধর্মের প্রতি আসক্তিকে বলছে মৌলবাদী পশ্চাদ-পদতা ও গোঁড়ামী।

মুসলিম দেশে এমন চেতনা ও এমন সংস্কৃতির বৃদ্ধি পেলে জনগণের মন থেকে আল্লাহতায়ালার ভয়ই বিলুপ্ত হয়। মুসলমানগণ তখন ভূলে যায় নিজেদের ঈমানী দায়বদ্ধতা। বরং বাড়ে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবনতা। ফলে বাংলাদেশ, মিশর, পাকিস্তান বা তুরস্কের মত দেশে আল্লাহর আইন তথা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা রুখতে কোন কাফেরকে অস্ত্র ধরতে হয়নি। সেকাজের জন্য বরং মুসলিম নামধারি সেক্যুলারগণই যথেষ্ঠ করা। কর্ম্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের জাগরণ ও মুসলিম শক্তির উত্থান রুখার লক্ষ্যে আজও দেশে দেশে পাশ্চত্যের অনুগত দাস গড়ে তোলার এটিই সফল মডেল। মার্কিন দখলদার বাহিনী সেটিরই বাস্তবায়ন করছে আফগানিস্তানে। এ স্ট্রাটেজীক কৌশলটির পারঙ্গমতা নিয়ে ব্রিটিশ শাসকচক্রের মনে কোন রূপ সন্দেহ ছিল না। যেখানে অধিকার জমিয়েছে সেখানেই এরূপ সেক্যুলারদেরকেই সযত্নে গড়ে তুলছে। তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাড়াতে যেখানে দেরী হয়েছে সেদেশের স্বাধীনতা দিতেও তারা বিলম্ব করছে। সে ব্রিটিশ পলিসির পরিচয়টি মিলে মিশরে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, “কোন ব্রিটিশ উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নই উঠেনা যতক্ষণ না সে

দেশে এমন এক সেক্যুলার শ্রেণী গড়ে না উঠে যারা চিন্তা-চেতনায় হবে ব্রিটিশের অনুরূপ।" ব্রিটিশ পলিসি যে এক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের মত সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর প্রশাসন, রাজনীতি, সেনাবাহিনী ও বিচার ব্যবস্থায় সেক্যুলার ব্যক্তিদের প্রবল আধিপত্য দেখে। আজও আইন-আদালতে ব্রিটিশের প্রবর্তিত পেনাল কোড। বাংলাদেশের সেক্যুলার সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ মুসলিম দেশের জনগণের রাজস্বের অর্থে প্রতিপালিত হলে কি হবে, দেশে যারা শরিয়ত বা আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা চায় তাদেরকে তারা ব্রিটিশদের ন্যায়ই শত্রু মনে করে। আর বিশ্বস্থ্য আপনজন মনে করে ভিন্ দেশী কাফেরদের। এদের কারণেই মুসলিম দেশে হামিদ কারজাইয়ের মত দাস পেতে ইসলামের শত্রুপক্ষের কোন বেগ পেতে হয় না।

ইসলামি দর্শন থেকে দূরে সরানো এবং মগজে সেক্যুলার চেতনার পরিচর্যা দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মত দেশে সেক্যুলার দিনক্ষণকে ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিচ্ছে। এরই উদাহরণ, বাংলাদেশের মত দেশে বসন্তবরণ বা নববর্ষের দিন উদযাপন। নবীজীর হাদীস, মুসলমানের জীবনে বছরে দুটি উৎসব। একটি ঈদুল ফিতর, এবং অপরটি ঈদুল আদহা বা কোরবানীর ঈদ। বাংলার মুসলমানগণ এ দুটো দিনই এতদিন ধুমধামে উদযাপন করে আসছে। বাংলার মুসলমানদের জীবনে নববর্ষের উৎসব কোন কালেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর কারণ, তাদের ভিন্নতর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যা একজন কাফের বা সেক্যুলার থেকে ভিন্ন। মুসলমানের জীবনে সে ভিন্নতর মূল্যায়ন আসে এ জীবন নিয়ে মহান আল্লাহর নিজস্ব মূল্যায়ন থেকে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর নিজস্ব ঘোষণাটি হলো, "তিনিই (আল্লাহতায়ালা) জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন যেন পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম।" -সুরা মুলক। অর্থাৎ মানুষের জন্য এ পার্থিব জীবন পরীক্ষার হল মাত্র। পরীক্ষার হলে বসে কেউ কি নাচগান করে না। উৎসবও বসায় না। নাচগান বা উৎসবের আয়োজন তো পরীক্ষার হলে মনযোগী হওয়াই অসম্ভব করে তোলে। এ ব্যাপারে নবীজীর হাদীস, "পানি যেমন শস্য উৎপাদন করে, গানও তেমনি মুনাফেকি উৎপন্ন করে।" প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের শক্তি ও মর্যাদা বাড়লেও নাচগান বাড়েনি। সংস্কৃতির নামে এগুলো শুরু হলে যেটি বাড়ে তা হলো পথভ্রষ্টতা। তখন সিরাতুল মোস্তাকিমে পথচলাই অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই এগুলো শয়তানের স্ট্রাটেজী হতে পারে, কোন মুসলমানের নয়।

নতুন বছর, নতুন মাস, নতুন দিন নবীজী(সাঃ)র আমলেও ছিল। কিন্তু তা নিয়ে তিনি নিজে যেমন কোনদিন উৎসব করেননি, সাহাবাগণও করেননি। অথচ তারাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়তে পেরেছিলেন। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাগান এ ব্যাপারে অতিশয় মনযোগী ছিলেন যেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে সমাজ বা রাষ্ট্রে এমন কিছুর চর্চা না হয় যাতে সিরাতুল মোস্তাকিমে চলাই অসম্ভব হয়। এবং মনযোগে ছেদ পড়ে ধর্মের পথে পথচলায়। ড্রাইভিং সিটে বসে নাচগানে মত্ত হলে সঠিক ভাবে গাড়ী চালানো যায়? এতে বিচ্যুতি ও বিপদ তো অনিবার্য। অবিকল সেটি ঘটে জীবন চালানোর ক্ষেত্রেও। নবীজী(সাঃ)র আমলে সংস্কৃতির নামে আনন্দ উপভোগের প্রতি এত আকর্ষণ ছিল না বলেই সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা তাদের জন্য সহজতর হয়েছিল। বরং তারা জন্ম দিয়েছিলেন মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতির প্রভাবে একজন ভৃত্যও খলিফার সাথে পালাক্রমে উঠের পিঠে চড়েছেন। এবং খলিফা ভৃত্যকে উঠের পিঠে বসিয়ে নিজে রশি ধরে টেনেছেন। সমগ্র মানব ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। অথচ বাংলাদেশে আজ সংস্কৃতির নামে কি হচ্ছে? এবারে (২০১০ সালে এপ্রিলে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা নববর্ষের কনসার্টে কী ঘটলো? যৌন ক্ষুধায় অতি উদভ্রান্ত অসংখ্য হায়েনা কি সেদিন নারীদের উপর ঝাপিয়ে পড়েনি? অসংখ্য নারী কি সেদিন লাঞ্ছিত হয়নি? কিছু দিন আগে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ব্যান্ড সঙ্গীতের আসরে কী ঘটলো? শত শত নারী কি সেদিন ধর্ষিতা হয়েছিল শত শত নারী। এটাই কি বাঙালী সংস্কৃতি? দেশের সেক্যুলার পক্ষ এমন সংস্কৃতির উৎকর্ষতা চায়?

নববর্ষ উদযাপনের নামে নারী-পুরুষদের মুখে উলকি কেটে বা নানান সাজে একত্রে রাস্তায় নামানোর রীতি কোন মুসলিম সংস্কৃতি নয়। বাঙালীর সংস্কৃতিও নয়। এমনকি বাঙালী হিন্দুদেরও নয়। নববর্ষে নামে বাংলায় বড়জোর কিছু হালখাতার অনুষ্ঠান হতো। কিন্তু কোন কালেই এদিনে কনসার্ট গানের আয়োজন বসেনি। জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিলও হয়নি। পাশ্চাত্যেও নববর্ষের দিনে এমন উৎসব দিনভর হয় না। বাংলাদেশে এগুলীর এত আগমন ঘটছে নিছক রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণে। যুদ্ধজয়ের লক্ষ্যে অনেক সময় নতুন প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্র সৈনিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনেক সময় তাতে বিজয়ও আসে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সাংস্কৃতিক যুদ্ধে সংস্কৃতির নামে এসব অভিনব আয়োজন বাড়ানো হয়েছে তেমনি এক ত্বড়া। বিজয়ের লক্ষ্যে। তাদের লক্ষ্য নাচ-গান, কনসার্টের নামে

জনগণকে ইসলাম থকেে দ ূরে সরানো□ বপি ুল সংখ ্যক নারী-প ুর ুষ নযি়ে নত ুন ঢংযরে এসব আয় োজন বাড়ানো হয়ছেে তমেনি এক ষড়যন ্ত ্রম ূলক প ্রয় োজন□ পাশ ্চাত ্যরে য ুবক-য ুবতীদরে ধর ্ম থকেে দ ূরে টানার প ্রয় োজন নহেঁ□ জন ্ম থকেইে তারা ধর ্ম থকেে দ ূর□ নাচগান, মদ, অশ ্লীলতা, উলঙ ্গতা ও ব ্যভচিাররে মধ ্য দযি়হে তাদরে বড়ে় উঠা□ তাই নববর ্ষরে নামে তাদরে মাঝে এ সবে অভ ্যস ্থ করার প ্রয় োজন নহেঁ□ কনি ্ত ু সটেরি প ্রয় োজন রয়ছেে বাংলাদশে□ সটেি ধর ্ম থকেে ও নজিদেরে সংস ্ক ৃত থিকেে দ ূরে সরানোর লক ্ষ ্যে□ এসবরে চর ্চা বাড়াতে কাজ করছে প ্রচ ুর দশেী-বদিশেী এনজওি□ এমন অন ুষ ্ঠানে বপি ুল অর ্থ ব ্যয়ও হচ ্ছ□ এবং সে অর ্থ আসছে বদিশেীদরে ভান ্ডার থকে□ এভাবে নারীপ ুর ুষরে অবাধ মলোমশোর পাশপাশি অশ ্লীলতারও স ুয োগ স ৃষ ্টি কিরা হচ ্ছ□ এবং ল ুপ ্ত করা হচছে ব ্যভচিার ও অশ ্লীলতাকে ঘ ৃণা করার অভ ্যাস, -যা পাশ ্চাত ্য থকেে বহ ু আগইে বলি ুপ ্ত হয়ছে□

শ ুধ ু বাংলাদশে নয়, অন ্যান ্য ম ুসলমি দশেওে এর ূপ নববর ্ষ পালনে মার ্কনি য ুক ্তরাষ ্ট ্রসহ অধকিাংশ পাশ ্চাত ্য দশে বপি ুল অংকরে অর ্থ সাহায ্য দচি ্ছ□ ইরানী-আফগানী-করিগজিী-ক ুর ্দীদরে নওরোজে উ□সবরে দনি প ্রসেডিনে ্ট ওবামা বশিষে বানীও দযি়ছে□ তবে নববর ্ষরে নামে বাংলাদশে ইসলামরে শত ্র ুপক ্ষরে বণিযি় োগরে মাত ্রাটি আরো বচিতি ্র ও ব ্যাপক□ এখানে বানী নয়, আসছে বপি ুল বণিযি় োগ□ কারণ, বাংলাদশেরে জনসংখ ্যা প ্রায় ১৫ কোটি□ আফগানসি ্তানরে চয়ে প ্রায় ৫ গ ুণ□ জনসংখ ্যার ৯০% ভাগ ম ুসলমান, যাদরে আপনজনরেরা ছড়যি়ে আছে ব ্শ ্বজি ুড়□ ফলে এদশেে ইসলামরে দর ্শন প ্রচার পলেে তা ছড়যি়ে পড়বে বশি ্বময়□ এ বশিাল জনগণকে ইসলাম থকেে দ ূরে সরযি়ে সকে ুলার সংস ্ক ৃততিে বশ করানো তাদরে কাছে তাই অতগি ুর ুত ্বপ ূর ্ণ□ তারা চায় এ প ৃথবিীটা একটি মিলে ্টিং পটে পরণিত হোক□ আল ু-পটল, পয়েঁাজ-মরচি যমেন চ ুলার তাপে কড়াইয়ে একাকার হয়ে যায়, তমেনি বিশ ্বরে সব সংস ্ক ৃতরি মান ুষ একক সংস ্ক ৃতরি মান ুষরে পরণিত হোক□ এভাবে নরি ্মতি হোক গ ্লোবাল ভলিজে□ আর সে গ ্লোবাল ভলিজেরে সংস ্ক ৃত হিবে পাশ ্চাত ্যরে সকে ুলার সংস ্ক ৃত□ এজন ্যই বাংলাদশেে নারী-প ুর ুষকে ভ ্যালনে ্টাইন ডে, বর ্ষপালন,মদ ্যপান, অশ ্লীল নাচ, পাশ ্চাত ্য ধাঁচরে কনসার ্টে অভ ্যস ্থ করায় এসব এনজওিদরে এত আগ ্রহ□ তারা চায় তাদরে সাংস ্ক ৃতকি সীমানা বাংলাদশেরে মত ম ুসলমি দশেরে প ্রত বিসতঘররে মধ ্যওে বসি ্ত ৃত হোক□ তাই বাংলাদশেরে সাংস ্ক ৃতকি সীমানা আজ বলি ুপ ্ত□

কনি ্ত ু আরো বপিদরে কারণ, এতবড় গ ুর ুতর বষিয় নযি়ে ক'জনরে দ ুশ ্চনি ্তা? কোন পরবিারে কউে ম ৃত ্য ুশর ্যায় পড়লে সে পরবিারে দ ুশ ্চনি ্তার অন ্ত থাকে না□ আর শয ্যাশায়ী সমগ ্র বাংলাদশে ও তার সংস ্ক ৃত□ অথচ ক'জন আলমে, ব ুদ ্ধজীবী, রাজনীতবিদি,শকি ্ষাবদি ও লখেক এ বষিয় নযি়ে উদ ্বগি ্ন□ ক'জন ম ুখ খ ুলছেনে বা প ্রতরিোধ গড়ে ত ুলছেনে? ১৭৫৭ সাল থকেে বাংলার ম ুসলমান কি সামান ্যতমও সামনে এগযি়ছে? তখন প ্রতষি ্ঠতি হয়ছেলি ব ্রটিশিরে দখলদার□ অস ্তমতি হয়ছেলি বাংলার ম ুসলমানদরে স ্বাধীনতা□ কনি ্ত ু সে পরাধীনতা বরি ুদ ্ধে কোন জনপদে, কোন গ ্রাম-গঞ ্জে কোন র ূপ প ্রতরিোধ বা বদি ্রোহরে ধ ্বনি উঠছেলি -সে প ্রমাণ নহেঁ□ বরং যে যার কাজকর ্ম নযি়ে ব ্যস ্ততা থকেছে□ দশেরে স ্বাধীনতা নযি়ে কছি ু ভাবা বা কছি ু করার প ্রয় োজনীয়তা কউে অন ুভব করনে□ি অথচ শত ্র ুর হামলার ম ুখে প ্রতরিোধরে এ দায়ভার প ্রতটিি ম ুসলমানরে□ এ কাজ শ ুধ ু বতেনভোগী সনৈকিরে নয়□ প ্রতটিি নাগরকিরে□ ইসলামে এটি জহিাদ□ ম ুসলমানদরে গৌরব কালে এজন ্য কোন সনোনীবাস ছলি না□ প ্রতটিি গ ৃহই ছলি সনোনীবাস□ প ্রতটিি য ুদ ্ধে মান ুষ স ্বচে ্ছায় সখোন থকেে য ুদ ্ধে গযি়ে হাজরি হয়ছে□ অথচ আজ সনোনীবাস বড়েছে অথচ হামলার ম ুখে কোন প ্রতরিোধ নহেঁ□ জহিাদ নহেঁ দশেরে সাংস ্ক ৃতকি সীমানার রক ্ষার কাজওে□

সাংস ্ক ৃতকি সীমানা রক ্ষার লড়াইয়ে পরাজতি হলে পরাজতি হতে হয় ঈমান-আক ্বীদা রক ্ষার লড়াইয়ওে□ কারণ, ম ুসলমানে ঈমান-আক ্বীদা কখন অনসৈলামকি সাংস ্ক ৃতকি পরবিশেে বড়ে় উঠে না□ মাছরে জন ্য যমেন পানি চাই, ঈমান নযি়ে বাঁচার জন ্যও তমেনি ইসলামি রাষ ্ট ্র ও ইসলামি সংস ্ক ৃত চাই□ ম ুসলমান তাই শ ুধ ু কোরআন পাঠ ও নামায-রোযা আদায় শ ুধ ু করনে,ি ইসলামি রাষ ্ট ্র এবং সে রাষ ্ট ্রে শরযি়ত ও ইসলামি সংস ্ক ৃতরিও প ্রতষি ্ঠা করছে□ ম ুসলমানদরে অর ্থ, রক ্ত, সময় ও সামর ্থরে সবচয়েে বশেী ভাগ ব ্যয় হয়ছেে তো ইসলামি রাষ ্ট ্র ও ইসলামি শকি ্ষা-সংস ্ক ৃতরি নরি ্মান□ নামায রোযার পালন তো কাফরে দশেওে সম ্ভব□ কনি ্ত ু ইসলামী শরযি়ত ও ইসলামী সংস ্ক ৃতরি প ্রতষি ্ঠা ও পরচির ্যা তথা ইসলামী বধিানরে প ূর ্ণ পালন কি অম ুসলমি দশেে সম ্ভব? অতীতরে ন ্যায় আজকরে ম ুসলমানদরে উপরও একই দায়ভার□ সটেি শ ুধ ু কলম-সনৈকিরে নয়, প ্রতটিি আলমে, প ্রতটিি শকি ্ষক, প ্রতটিি ছাত ্র ও প ্রতটিি নাগরকিরে উপরও□ এ লড়াইয়ে তাদরেকওে ময়দানে নমেে আসতে হবে□ এবং এ লড়াই হতে হবে কোরআনী জ ্ঞানরে তরবারী দ ্বারা□ নবীজী (সাঃ)র য ুগে সটেইি হয়ছে□ ইসলামে জ ্ঞানার ্জনকে এজন ্যই নামায-রোযার আগে ফরয করা হয়ছে□ কনি ্ত ু সে ফরয পালনরে আয় োজনই বা কোথায়?

অনেকেই জ্ঞানার্জন করছেন নিছক রুটিরুজির তালাশে। ফরয আদায়ের লক্ষ্যে নয়। প্রচণ্ড শূণ্যতা ও বিচ্যুতি রয়েছে জ্ঞানার্জনের নিয়তেই। ফলে সে জ্ঞানচর্চায় তাদের রুটি-রুজী জুটছে ঠিকই, কিন্তু সে জ্ঞানার্জনে ফরয আদায় হচ্ছে না। এবং জিহাদের ময়দানে বাড়ছে না লোকবল। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এটি এক বিপদজনক দিক। আগ্রাসী শত্রুর হামলার মুখে অরক্ষিত শুধু দেশটির রাজনৈতিক সীমান্তই নয়, বরং প্রচণ্ড ভাবে অরক্ষিত দেশের সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক সীমান্তও। দেশ তাই দ্রুত ধেয়ে চলছে সর্বমুখি পরাজয় ও প্রচণ্ড বিপর্যয়ের দিকে।